প্রবন্ধ

পরমাণু বিদ্যুতের রাজনীতি

এস কুমার

৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ রাষ্ট্রসংঘের একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। এই সভা আহ্বানের পিছনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনআওয়ার, এবং তিনিই ছিলেন সভার মূল বক্তা। এধরনের উদ্যোগের এখানেই শেষ নয়। এর পর ১৯৫৫ ও ১৯৫৬-তে জেনেভায় পর পর দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদরা। উদ্দেশ্য ছিল আগামী দিনে পরমাণু বিদ্যুতের লক্ষ্যে পারমাণবিক গবেষণার তথ্যাদির আদান-প্রদান। আপাতদৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সে-সময়কার এই বিশাল উদ্যোগকে দেখে মনে হতে পারে, তৎকালীন মার্কিন সরকার তথা তার রাষ্ট্রপতি সারা পৃথিবীর শক্তি সমস্যা সমাধানে খুবই উদ্যোগী ছিলেন। আসলে সমস্যাটা ছিল মার্কিন সরকারের নিজের। রাশিয়া যদি ১৯৪৯-র ২৯ আগস্ট পরমাণু-বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ না ঘটাতো, তাহলে হয়তো ওই সময়ে আইজেনআওয়ারকে ঐ ভূমিকায় দেখা যেতো না।

হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের পর যে আন্তর্জাতিক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল তা কোনভাবেই মার্কিন প্রশাসনের পরমাণু অস্ত্র-কর্মসূচিকে প্রভাবিত করতে পারেনি, এবং মার্কিন প্রশাসন তার এই কর্মসূচি নিয়ে ঠিক ঠিক ভাবেই এগোচ্ছিল। ম্যানহাটন প্রকল্প থেকে তারা স্পষ্টই বুঝেছিল যে আগামীদিনে পরমাণু অস্ত্রের কর্মসূচিকে চালিয়ে যেতে হলে পরমাণু চুল্লিতে তৈরি হওয়া প্লুটোনিয়ামের উপর নির্ভর করতেই হবে— যেহেতু ইউরেনিয়ামের আহরণ ও সমৃদ্ধকরণ যেমন খরচসাপেক্ষ, তেমনি সময়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, একই সাথে পরমাণু চুল্লিতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ তৈরি হবে তা আর্থিক দিক থেকে লাভজনক না হলেও মোট খরচের অন্তত একটা অংশ উঠে আসবে। যাই হোক, পরমাণু অস্ত্রের কর্মসূচি মাথায় রেখে মার্কিন সরকার ১৯৪৬ সালেই ২২টি কর্পোরেট সংস্থাকে পরমাণু প্রযুক্তি উৎপাদনের লাইসেন্স দেয়। ঐ একই বছরে যথোপযুক্ত আইনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করে, যা ম্যাকমোহন আইন নামে পরিচিত। ওই আইনের মর্মবস্তু অনুযায়ী পরমাণু অস্ত্রের গবেষণা থেকে পরমাণু বিদ্যুতের গবেষণাকে পৃথক করা একেবারেই অসম্ভব। এজন্য পুরো বিষয়টাকেই গোপনীয়তার বেড়াজালে আটকে রাখা হয়েছিল। সমস্ত পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিল রাশিয়ার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। রাশিয়া ভবিষ্যতে কোন সময় পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাবে এবিষয়ে মার্কিন প্রশাসন নিশ্চিত ছিল, কিন্তু সেটা যে এতো দ্রুত হবে এ বিশ্বাস তাদের ছিল না। মার্কিন প্রশাসন ভেবেছিল রুশ বোমার বিস্ফোরণ পর্যন্ত যে সময় পাওয়া যাবে সে সময়ের মধ্যে মার্কিন পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং সারা পৃথিবীর উপর মার্কিনিদের একচেটিয়া সামরিক প্রভুত্ব কায়েম হবে।

রুশ বিস্ফোরণের কারণে পরমাণু-গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যাদির উপর মার্কিন গোপনীয়তা নিরর্থক হয়ে পড়লো। বস্তুত এরকম পরিস্থিতির চাপেই মার্কিন প্রশাসনকে 'শান্তির জন্য পরমাণু' নিয়ে ব্যাপক প্রচারে যেতে হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশন ও পরবর্তী আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলি এরই ফলশ্রুতি। এ ঘটনায় মার্কিন স্বার্থ বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হয়নি, বরং তাদের স্বার্থ আরও সুরক্ষিত হয়েছে এবং তার আকারও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমত, রাষ্ট্রসংঘের অধীনে ১৯৫৭-তে গঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি (IAEA), যার প্রধান কাজ পরমাণু বিদ্যুৎ কর্মসূচির সম্প্রসারণ এবং এমন এক নজরদারি ব্যবস্থা তৈরি করা যাতে কোন দেশ পরমাণু বিদ্যুৎ কর্মসূচি থেকে পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচিতে না যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় একচেটিয়া সামরিক প্রভুত্ব কায়েম হবে না ঠিকই, কিন্তু গুটিকয়েক দেশ ছাড়া বাকি সব দেশকেই পরমাণু-অস্ত্র কর্মসূচি থেকে সরিয়ে রাখা যাবে। দ্বিতীয়ত, পরমাণু চুল্লি রপ্তানির ব্যবসাতে মার্কিন কোম্পানিগুলির বিশাল সুযোগ তৈরি হবে। বলা বাহুল্য, পরমাণু চুল্লি রপ্তানির ব্যবসায়ে এখনও মার্কিনদেরই একাধিপত্য।

এভাবেই একেবারে শুরুতে পরমাণু বিদ্যুৎকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল একটি অত্যন্ত কঠোর প্রতিষ্ঠান, যার নাম IAEA। IAEA রাষ্ট্রসংঘের অধীনস্থ সংস্থা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার নিয়ন্ত্রণ মার্কিন দেশের হাতে; অথচ এর বিশাল পরিচালন খরচ যোগাতে হয় সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে। যে সব রাষ্ট্র সে সময় বা পরবর্তীতে পরমাণু বিদ্যুৎ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দেশে আইনি কাঠামো তৈরি করতে হয়েছে এবং তদনুযায়ী প্রশাসনিক কাঠামোও তৈরি করতে হয়েছে।

পরমাণু বিদ্যুতের যুগ শুরু হওয়ার অল্প কিছুকালের মধ্যেই একের পর এক সমস্যা দেখা দিতে লাগলো। সমস্যাগুলির কেন্দ্র প্রধানত দু'টি। প্রযুক্তিগত দুর্বলতা এবং তেজস্ক্রিয় আবর্জনা। সমস্যাগুলির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করল গবেষণা ও উন্নয়ন বাবদ খরচ ও তার পরিকাঠামোর আকার। গবেষণা পরিকাঠামোর আকার দেশীয় ও বহুজাতিক— উভয় স্তরেই বৃদ্ধি

পেতে লাগলো। এই বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সমস্ত স্তরে পরমাণু ব্যবস্থাপনার সাথে কর্পোরেট দুনিয়ার সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো। সব মিলিয়ে পরমাণু বিদ্যুৎকে ঘিরে রয়েছে অনেক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত এবং প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের সাথে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত থেকে পরমাণু প্রযুক্তিকে ধরে রেখেছে।

আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো তার কেন্দ্রীভূত প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র। কোন প্রযুক্তিই এর বাইরে নয়। কিন্তু পরমাণু প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠানিক চরিত্র একেবারেই ব্যতিক্রমী। এর কারণ এটাই যে একই প্রযুক্তির মধ্যে সামরিক ও অসামরিক উভয় উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। উদ্দেশ্য শুধুই যদি অসামরিক হতো তাহলে হয়তো পরমাণু প্রযুক্তি অনেক আগেই অপ্রচলিত হয়ে যেতো, অথবা গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে উৎপাদন জগতে প্রবেশ করতেই পারতো না। বিপরীতে উদ্দেশ্য যদি শুধুই সামরিক হতো, তাহলে এতো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী হতো না এবং প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র কঠোর হলেও তার আকার এত বিস্তৃত হতো ন।

জেনেভা সম্মেলনে বহু সদস্য রাষ্ট্র যোগ দিলেও শুরুতে খুব কম রাষ্ট্রই পরমাণু বিদ্যুৎ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এদের অনেকের কাছেই পরমাণু বিদ্যুতের চাইতে পরমাণু অস্ত্রের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভারত অবশ্যই এর এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। বর্তমান পৃথিবীতে অনুমোদিত (!) পাঁচটি রাষ্ট্র ছাড়া আরও অনেকের হাতেই গোপনে অথবা প্রকাশ্যে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। যে সব রাষ্ট্র একসময় পরমাণু বিদ্যুৎ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, অথচ পরমাণু অস্ত্রের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র ঝোঁক বা আকর্ষণ নেই তারা অনেকেই বর্তমানে পরমাণু বিদ্যুতের প্রতি নিস্পৃহ। ডেনমার্ক ১৯৮৫-তে পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে সরে এসেছে। জার্মান ও সুইডেন প্রভৃতি দেশ ক্রমশ তাদের পরমাণু বিদ্যুৎ কর্মসূচি গুটিয়ে নিচ্ছে এবং অনেক দেশই নতুন করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে অনাগ্রহী। এর প্রধান কারণ তেজস্ক্রিয় আবর্জনার সমস্যা এবং অর্থনৈতিক কারণ।

এখন পর্যন্ত পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলে ভরতুকিতে। এটা সাধারণভাবে বোঝার উপায় নেই, কারণ পরমাণু বিদ্যুৎকে কেন্দ্র করে যে সব প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যর কথা আগে বলা হয়েছে, তাদের সব খরচ কখনও একত্র হিসেব করে পরমাণু বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। অথচ সবগুলি খরচের লক্ষ্যই পরমাণু বিদ্যুৎ। রাষ্ট্রের তরফে পরমাণু বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ হিসেবে যা তুলে ধরা হয় তা প্রধানত পরমাণু চুল্লি পর্যন্ত পরমাণু জ্বালানিচক্রের খরচ। অবশ্য এতেও ফাঁকি আছে। কেননা বেশির ভাগ দেশেই তাদের আইন অনুযায়ী এই খরচ পরীক্ষার কোন সুযোগ নেই। গবেষণা ও উন্নয়নের খরচ, IAEA বাবদ খরচ ও আইনি পরিকাঠামো অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালনার খরচ বাজেটের অন্যান্য সাধারণ খরচ হিসেবেই দেখানো হয়। পরমাণু বিদ্যুৎ কর্মসূচি যদি না থাকতো, তাহলে একমাত্র গবেষণা ও উন্নয়ন বাবদ আংশিক খরচ ছাড়া বাকি খরচগুলির একটিরও প্রয়োজন হতো না।

উপরিউক্ত খরচগুলি ছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ খরচ রয়েছে। এটাকে অনাগত খরচ বলাই ভাল। চুল্লিতে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় আবর্জনার কোন সামাজিক ব্যবহার নেই, অথচ এগুলি ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। এদেরকে কঠোর নিরাপত্তায় সংরক্ষণ করা ছাড়া অন্য কোন নির্বাহীকরণ (Disposal) ব্যবস্থা নেই। বলা বাহুল্য, এখন পর্যন্ত যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা একটা সাময়িক ব্যবস্থা। চূড়ান্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা কী হতে পারে বা হবে, তা এখনও গবেষণার বিষয়, কারণ সংরক্ষণের সময়টা দশ-বিশ বছর নয়, বরং কয়েক'শ থেকে কয়েক লক্ষ বছর। এত বছরের খরচ শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়াবে তা আগাম অনুমান করাও সম্ভব নয়। এখন পর্যন্ত যতো তেজস্ক্রিয় আবর্জনা তৈরি হয়েছে তাদের জন্য নিয়মিত একটা খরচ আছেই, যা পরমাণু বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ হিসেবে আসে না, আসা সম্ভবও নয়।

অনাগত খরচ আরও একটি আছে। যে কোন শিল্প কারখানার জীবনকাল শেষ হয়ে গেলে তার অবশেষ বিক্রি করে কিছু অর্থাগম হয়। কিন্তু পরমাণু চুল্লিসহ পরমাণু জ্বালানিচক্রের যে কোন প্ল্যান্ট তার কার্যকাল শেষ করার পর একটি তেজস্ক্রিয় পিণ্ডে পরিণত হয়। এদের নির্বাহীকরণের এককালীন খরচের অঙ্ক অবশ্যই বিশাল। যেহেতু পিণ্ডটিকে ভেঙে ছোট ছোট অংশে পরিণত করে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বাকি খরচ অন্যান্য তেজস্ক্রিয় আবর্জনার মতোই।

সমস্ত খরচের একটা অংশ পারিশ্রমিক হিসেবে বিজ্ঞানী, গবেষক, বিশেষজ্ঞ, আমলা ও অন্যান্য কর্মচারীরা পেয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য বিদ্যুৎ প্রকল্পের (তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি) সাথে যুক্ত সমশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের চেয়ে এদের পারিশ্রমিক, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব অনেক বেশি। খরচের অবশিষ্ট বৃহদাংশের উপভোক্তা যন্ত্র/যন্ত্রাংশ, বিভিন্ন উপকরণ ও বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহকারী দেশি ও বিদেশি বেসরকারি সংস্থা। এরা সবাই মিলে তৈরি হয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী। পরমাণু বিদ্যুতের সুবাদে সাধারণ জনগণ প্রদত্ত করের অর্থ রাষ্ট্রের মাধ্যমে এই সব স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে নিয়মিতভাবে চলে যায় কোনরকম output ছাড়াই। বাস্তবিক, এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র ও অর্থনীতির দৃষ্টিকোণে পরমাণু বিদ্যুৎ একটি অনৈতিক অভিসার। প্রকাশ্যে বা গোপনে পরমাণু অস্ত্রের কর্মসূচি না থাকলে এ জাতীয় অনৈতিক অভিসার একেবারেই স্বাভাবিক নয়। ঠিক এই কারণেই ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইডেন প্রভৃতি দেশ পরমাণু বিদ্যুৎকে হয় পরিত্যাগ করেছে, নয়তো পরিত্যাগ করার পথে।

ঘোষিত পরমাণু অস্ত্রধর রাষ্ট্রগুলিতে খরচের বিষয়টা একেবারেই স্বাভাবিক। পরমাণু চুল্লিতে যে বিদ্যুৎ ও প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয় তার মধ্যে বিদ্যুৎ অসামরিক এবং প্লুটোনিয়াম সামরিক পণ্য। একেবারে শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও কানাডায় পরমাণু চুল্লি বসানো হয়েছিল। কানাডা বাদে বাকি চারটি দেশেরই পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি ছিল। কানাডার পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি না থাকা সত্ত্বেও তার পরমাণু চুল্লি চালাতে অসুবিধা হতো না, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডার কাছ থেকে প্লুটোনিয়াম কিনে নিতো। তবে প্লুটোনিয়ামের ব্যবসাও অনেক কাল যাবৎ পড়তির মুখে। সমস্ত পরমাণু অস্ত্রধর দেশগুলিতে মোট যে পরিমাণ পরমাণু বোমা সঞ্চিত রয়েছে তাদেরকে যদি হিরোশিমার বোমার আকারে (২০০০০ টন টিএনটি-র সমতুল্য) পরিণত করা হয় তাহলে যতো পরমাণু বোমা পাওয়া যাবে, সেগুলোকে প্রতি মিনিটে একটি করে ফাটালে প্রায় দু'বছর লাগবে সেগুলি শেষ করতে। এজন্য মার্কিন, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ও চীন— এই পাঁচটি রাষ্ট্রে পরমাণু অস্ত্রের জন্য প্লুটোনিয়ামের চাহিদা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এইসব দেশে অনেকদিন ধরেই পরমাণু বিদ্যুৎ কর্মসূচি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। মার্কিন, বৃটেন ও ফ্রান্সে পরমাণু শক্তি বিরোধী আন্দোলনের চাপেও পরমাণু বিদ্যুৎ কর্মসূচি পিছিয়ে পড়েছে।

পরমাণু চুল্লি-সহ পরমাণু জ্বালানিচক্রের বিভিন্ন প্রযুক্তি তৈরির জন্য ১৯৪৬ থেকেই বিভিন্ন উৎপাদক সংস্থা বিনিয়োগ শুরু করেছিল। ৫০-এর দশকের শেষ এবং ৬০-এর দশকের প্রথম দিকে পরমাণু বিদ্যুতের প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎসাহের কারণে বিনিয়োগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, বিনিয়োগের সিংহভাগই ঘটেছিল মার্কিন দেশে। '৭০-এর দশকের শেষ থেকেই পরমাণু বিদ্যুৎ শিল্পে মন্দার যুগ শুরু। পূর্বোক্ত অন্যান্য কারণের সাথে থ্রি-মাইল আইল্যান্ড ও চের্নোবিলের দুর্ঘটনা এই মন্দাকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। '৯০-এর দশকের পর থেকে ভারতের মতো অত্যুৎসাহী দু'একটি দেশ ছাড়া, পরমাণু বিদ্যুৎ শিল্পের অবস্থা একমাত্র ডুবন্ত জাহাজের সাথেই তুলনীয়।

পরমাণু-বিদ্যুৎ শিল্পে এই মন্দার জন্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্থ পরমাণু প্রযুক্তি নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি। কারণ, তাদের বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে।

এই সব বিনিয়োগকারীদের মধ্যে জেনারেল ইলেকট্রিক-হিতাচি, ওয়েস্টিং হাউস-তোশিবা, রশ অ্যাটম, অ্যাটমস্ট্রয়-এক্সপোর্ট ও এ্যারিভা প্রভৃতি বহুজাতিক কোম্পানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে USA-এর ওয়েস্টিংহাউস ও জেনারেল ইলেকট্রিক গুরুত্ব ও ব্যবসার বিচারে অনেক এগিয়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার বেশিরভাগ চুল্লির সরবরাহকারী এই দুটি সংস্থা। পরমাণু জ্বালানি চক্রের প্রযুক্তি মানে শুধু নিউক্লিয়ার চুল্লি নয়। এর সাথে রয়েছে মাইনিং, মিলিং, কনভারসন, এনরিচমেন্ট, ফেব্রিকেশন ও রিপ্রসেসিং সংক্রান্ত আরও অনেক যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও প্ল্যান্ট। স্বাভাবিক কারণেই অনেক ছোট-বড় দেশি-বিদেশি সংস্থা সহযোগী হিসাবে এইসব দৈত্যাকার কোম্পানিগুলির সাথে যুক্ত রয়েছে। অতএব রাষ্ট্রের উপর এই সংস্থাগুলির প্রবল চাপ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একদিকে নতুন করে পরমাণু অস্ত্রের বিষয়টা আগের চাইতে অনেক হাল্কা এবং অন্যদিকে বিভিন্ন দেশে পরমাণু বিদ্যুতের যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ১৯৫৭-এর মত পরমাণু-বিদ্যুতের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকালতি আর সম্ভব হচ্ছে না। তাহলেও চেষ্টার খামতি নেই। অনেক চেষ্টার ফলে ঘুরপথে একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে— ভূ-উষ্ণায়ণকে সামনে রেখে পরমাণু বিদ্যুতের প্রাসঙ্গিকতাকে ব্যাপক প্রচারে আনা। ইতিমধ্যে কিছু সুফলও মিলেছে, যার অন্যতম উদাহরণ ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি।

IPCC-এর পূর্ব-প্রকাশিত তিনটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ভূ-উষ্ণায়ণের বিষয়টি অনেকদিন ধরেই আন্তর্জাতিকভাবে একটি বিবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু চতুর্থ প্রতিবেদনটির বক্তব্য একরকম হুঁশিয়ারির পর্যায়ে। IPCC গঠিত হওয়ার পরপরই ১৯৯২-তে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও-তে অনুষ্ঠিত হয় বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit)। এই সম্মেলন থেকে জন্ম নেয় UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) এরপর প্রতিবছরই কোন কোন না দেশে UNFCCC-এর একটা করে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে। সর্বশেষ সম্মেলনটি হয়ে গেল ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে। এটুকু ইতিহাস বলার কারণ বসুন্ধরা সম্মেলন থেকে শুরু করে কোপেনহেগেন পর্যন্ত প্রতিটি সম্মেলনের একটিই বার্তা, তা হলো ভূ-উষ্ণায়ণ দ্রুতবেগে ধাবমান এবং এর জন্য অন্যতম অপরাধী কার্বন-ডাই অক্সাইড (CO_2)। প্রতিটি সম্মেলনের বার্তা থেকে অধিকতর তীব্র হুঁশিয়ারি। ঠিকই, এভাবেই ধাপে ধাপে বাজার গরম করতে হয়। IPCC-এর তৃতীয় প্রতিবেদন পর্যন্ত ভূ-উষ্ণায়ণ সম্পর্কে কোথাও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছু মাত্রায় থেকে থাকলেও, চতুর্থ প্রতিবেদন ভূ-উষ্ণায়ণকে একেবারে নিশ্চিত করে দিয়েছে।

ভূ-উষ্ণায়ণের জন্য যেকোন গ্রীনহাউস গ্যাসই দায়ী। CO_2-ই একমাত্র গ্রীনহাউস গ্যাস নয়। মিথেন ও নাইট্রোজেন অক্সাইড, CO_2 অপেক্ষা কিছুমাত্র কম অপরাধী নয়। দ্বিতীয়ত, কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম— উভয় জীবাশ্ম জ্বালানিই CO_2-এর উৎস হওয়া সত্ত্বেও পেট্রোলিয়াম এখনও পর্দার আড়ালে। কয়লাকে প্রচারে আনার উদ্দেশ্য এই যে কয়লা থেকে সৃষ্ট তাপবিদ্যুৎ-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে পরমাণু বিদ্যুৎকে প্রচারে আনা অনেক সহজ। নাইট্রোজেন অক্সাইড, মিথেন ও পেট্রোলিয়াম প্রভৃতিকে যদি সমগুরুত্বে প্রচারে আনা হতো তাহলে এটা সম্ভব হতো না। UNFCCC এভাবেই পরোক্ষভাবে পরমাণু বিদ্যুতের

পক্ষে প্রচারে সক্রিয় আন্তর্জাতিক সংগঠন। IPCC-এর প্রতিবেদনও অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন। যে সব মডেলকে ভিত্তি করে প্রতিবেদন তৈরি যে সব মডেল নিয়েও অনেক প্রশ্ন। বলা বাহুল্য, এসব বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে গ্রীনহাউস গ্যাস আদৌ ক্ষতিকর নয় এবং ভূ-উষ্ণায়ণের সম্ভাবনা নেই। CO_2 সহ সমস্ত গ্রীনহাউস গ্যাসকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ও পরমাণু জ্বালানি— উভয়কে বাদ দিয়েই এটা করতে হবে। এটা একেবারেই অবাস্তব নয়, যদিও একে অবাস্তব করে রাখা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ক) '৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন দেশে পরমাণু-শক্তি বিরোধী ব্যাপক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সৌরশক্তির গবেষণা বেশ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন (১৯৭৪) নিজেও সৌর শক্তির প্রতি কিছুটা দুর্বলতা পোষণ করতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বাজেট বরাদ্দের সময় দেখা গেল নিক্সন গতানুগতিক প্রবণতা অতিক্রম করতে পারলেন না। ১৯৭৪-এ শক্তি গবেষণা খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১.০০২ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৬২ শতাংশ পেয়েছে পরমাণু শক্তি, ১৭ শতাংশ পেয়েছে কয়লা, ১০ শতাংশ পেয়েছে শক্তি ক্ষেত্র থেকে দূষণ প্রতিরোধী গবেষণা। বাকী ১১ শতাংশ পেয়েছে শক্তি সংক্রান্ত অন্যান্য গবেষণা। এই ১১ শতাংশ থেকে ১ শতাংশ জুটেছে সৌরশক্তির গবেষণায়।

খ) অ্যামরি লোভিন্‌স্ 'ফ্রেন্ডস্ অফ আর্থ'-এর সাথে যুক্ত একজন পদার্থবিজ্ঞানী এবং শক্তি-নীতি বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৯৭৬-এ *Soft Energy Path* নামে একটি সাড়া জাগানো বই লেখেন। বইটির বিষয়বস্তু চিরাচরিত শক্তির বিপক্ষে এবং সৌরশক্তির পক্ষে। লোভিনসের যুক্তি এবং বক্তব্য এত তীক্ষ্ণ ছিল যে পরমাণু এবং জীবাশ্ম জ্বালানির অনুগামীরা ঘাড় ঘুরিয়ে থাকতে পারেনি। বিভিন্ন দৈনিক ও পত্র-পত্রিকাতেও লোভিন্‌সের বিরুদ্ধে বিস্তর লেখালেখি শুরু হলো। তিনিও অনেক ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ জবাব দিয়েছেন। সিনেটে শুনানির সময় এইসব লেখাপত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এর আকার দাঁড়িয়েছিল ২২০০ পৃষ্ঠা।

রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী এবং নবীকরণযোগ্য শক্তির একনিষ্ঠ সমর্থক। সে কারণে তার নির্বাচনী প্রচারে পরমাণু শক্তি বিরোধী বহু সংগঠন সামিল হয়েছিল। নির্বাচনের আগে কার্টার লোভিন্‌সের বইটি পড়ে এতো উৎসাহিত হয়েছিলেন যে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ১৮ই অক্টোবর ১৯৭৭ তিনি লোভিন্‌স্‌কে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ করে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই ঘটনা পরিবেশবাদীদের খুবই আশান্বিত করেছিল। কিন্তু ১৫ই জুলাই ১৯৭৯ এক বক্তৃতায় কার্টার প্রস্তাবাকারে জানালেন— 'এনার্জি মবিলাইজেশন বোর্ড' পরিবেশ সংক্রান্ত বিধি-নিয়মাবলীকে আংশিকভাবে বাতিল করতে পারবে। কার্টারের এই বক্তৃতার পর পরিবেশবাদীরা সম্যক বুঝতে পারলেন, প্রাক্ নির্বাচনী কার্টারের সাথে রাষ্ট্রপতি কার্টারের কোন মিল নেই।

গ) বৃটেনের লেবার পার্টির কর্মসূচিতে নবীকরণযোগ্য শক্তির বিকাশ একটি অন্যতম বিষয়। কিন্তু ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত এক দশকে এই খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৩.৬ মিলিয়ন পাউন্ড। অর্থাৎ প্রতি বছরে মাত্র ৩.৬ লক্ষ পাউন্ড। ২০০৪ সালে হাউস অফ্ লর্ডস্-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি এজন্য লেবার পার্টির সরকারকে যথেষ্ট সমালোচনা করেছে।

ঘ) ভারতে নবীকরণযোগ্য শক্তির গবেষণা নামে বিষয়টা আগে ছিলই না। এই খাতে প্রথম বাজেট বরাদ্দ হয় ১৯৮০-৮১ অর্থবর্ষে। বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪.৪৪ কোটি টাকা। অথচ ওই একই অর্থবর্ষে পরমাণু শক্তির গবেষণায় বরাদ্দ ছিল ৭৩.৪৮ কোটি টাকা।

এর উল্টো চিত্রও রয়েছে। এই মুহূর্তে সুইডেনে মোট শক্তির ৪৭ শতাংশ আসে নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে। স্পেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ডে এই পরিমাণ যথাক্রমে ১৬ শতাংশ, ২০ শতাংশ ও ২৬ শতাংশ। এমনকি ভারতেও এই মুহূর্তে নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের পরিমাণ পরমাণু বিদ্যুৎ অপেক্ষা অনেক বেশি। ভারতে বর্তমানে পরমাণু বিদ্যুতের পরিমাণ ৩ শতাংশেরও কম। একে বিসর্জন দিতে হলে বিকল্পেরও প্রয়োজন হয় না। ২০২০-এর মধ্যে ভারত সরকারের লক্ষ্য ২০,০০০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন। এ যাবৎ কোন দিনই ভারত সরকার পরমাণু বিদ্যুতের লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেখানে পৌঁছাতে পারে নি। কিন্তু মূল প্রশ্নটা হলো কার স্বার্থে পরমাণু বিদ্যুৎ? প্রকৃত প্রয়োজন কতটা সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহ থাকলেও আগামী দিনে বিদুৎ সমস্যা সমাধানের জন্য পরমাণু বিদ্যুৎকে বাদ দিয়ে এগিয়ে চলার অনেক পথ খোলা রয়েছে। নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস তাদের মধ্যে অবশ্যই অন্যতম।

পরিশেষে ভারতের সাম্প্রতিক পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে দু'একটা কথা না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। UNFCCC কে শিখণ্ডী রেখে পরমাণু শক্তির পক্ষে এত প্রচার সত্ত্বেও এখনও পরমাণু শক্তির প্রতি আসক্তি বিভিন্ন দেশের তৈরি হয়নি। ব্যতিক্রম ভারত সরকার। ভারত সরকার CTBT তে স্বাক্ষরকারী দেশ নয়। উপরন্তু ভারতে পরমাণু জ্বালানিরও অভাব। এমতাবস্থায় পরমাণু শক্তির সম্প্রসারণে পরমাণু চুক্তি ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু কেন পরমাণু শক্তির প্রয়োজন— এ প্রশ্নটি আলোচনার বৃত্তের বাইরে রাখা হচ্ছে। সরকারি বক্তব্য UNFCCC-এর বার্তার সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। লোকসভায় যারা মার্কিন-ভারত পরমাণু-চুক্তির বিরোধিতা করেছেন তাদের বক্তব্যও অদ্ভুত: 'পরমাণু শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু পরমাণু চুক্তি নয়'। ভাবের ঘরে চুরি। পরমাণু শক্তির বিরোধিতা না ক'রে পরমাণু চুক্তির বিরোধিতার অর্থ প্রকারান্তরে পরমাণু চুক্তিকে সমর্থন করা।